পবিত্র প্রবারণা পূর্ণিমা প্রসঙ্গ কিছু কথা

ড. জিনবোধি ভিক্ষু

থেরবাদী বৌদ্ধ বিশ্বে পবিত্র প্রবারণা পূর্ণিমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবহ বিষয়। গৃহী উপাসক-উপাসিকাদের পাশাপাশি আত্মত্যাগী, গৈরিকবসনধারী এবং বিনয়শীল ভিক্ষুদের জন্য সমধিক গুরুত্বপর্ণ বিষয় হচ্ছে পবিত্র প্রবারণার পূর্ণিমা। সাধারণ গৃহী সমাজের ছোট-বড় আবাল বৃদ্ধ বণিতা এমনকি সার্বজনীনভাবে এই মহান প্রবারণা পূর্ণিমা অতীব আনন্দোৎসব, মিলন মেলা, সম্প্রীতি, সৌদার্হ্য, মৈত্রীময় ভালোবাসা এবং আন্তরিকতাপূর্ণ সু-সম্পর্কে তৈরীর এক মহামাঙ্গলিক দিবস হিসেবে প্রতিভাত হয়। বিশেষ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ত্রৈ-মাসিক উপোসথ ব্রত গ্রহণের সমাপ্তি দিবস হিসেবে স্বীকৃত। এ দিবসের পর দিন ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকাগণ সম্মিলিতভাবে মহান ভিক্ষুসংঘদেরকে দানোত্তম কঠিন চীবর দান প্রদান করার মহোৎসব হিসেবে সূচিত হয়। বৌদ্ধ পরিবারের ছোট বড়, আবাল, বৃদ্ধ বনিতা সবাই সম্মিলিতভাবে প্রবারণা পূর্ণিমার দিনে ফানুস বাতি উড়ানোর মহা আনন্দে মেতে উঠে। এই ফানুসবাতি উড়ানোর পেছনে দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা স্মরণযোগ্য। প্রথমত: রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতম সংসার জীবন ত্যাগ করে অনোমা নদীর তীরে এসে স্বীয় মস্তকের কেশরাশি কর্তনপূর্বক সত্যক্রিয়া করে বলেছিলেন, আমার বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভের যদি হেতু বা প্রভাব থেকে তাহলে শূন্য মার্গে ছুঁড়ে দেওয়া কেশরাশি নিম্নদিকে পতিত না হয়ে উর্ধ্ব দিকে গমন করবে। জন্ম জন্মান্তরেরর অপ্রমেয় পুণ্যের ফল সেদিন উত্থিত কেশরাশি দেখে রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতম অনেকটা আশান্বিত হয়েছিলেন যে, আমি সময় সাপেক্ষ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করব। দ্বিতীয়ত: রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতম সংসার ত্যাগের পর থেকে ক্রমাগত আধ্যাত্মিক ধ্যান সাধনাবলে এক শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধ জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে জগতে বুদ্ধ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। একদা ধ্যানসনে বসে জ্ঞান জাল বিস্তার করে পৃথিবী অবলোকন করতে গিয়ে এক শুভক্ষণে গর্ভধারিণী মাকে স্মৃতিপটে অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখন তিনি সংকল্প করেছিলেন আমাকে মাতৃঋণ পরিশোধ করতে হবে শুধু তা নয়; আমার অধীত বিদ্যা মাতৃদেবীর জ্ঞান করে জাগতিক ও আত্যন্তরিক দুঃখ মুক্তির জ্ঞানে জ্ঞাত করাতে হবে। তখন পবিত্র আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিশা দিবস পর্যন্ত ক্রমাগত তিনমাসে তথাগত বুদ্ধ মাকে অভিধর্ম দেশনা করে জীবনদর্শন ও জীবন উপলব্ধির এবং দুঃখমুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে শুভ আশ্বিণী পূর্ণিমা দিবসে তুষিত স্বর্গ থেকে মর্ত্তে পর্যন্ত দেবশক্তির প্রভাবে অভিনব সিড়ি সংযোজিত হয়ে দেবতা ও মানুষের সমাগমে বুদ্ধের মস্তক উপরি ছত্র ধারণ পূর্বক তুষিত স্বর্গ থেকে মর্ত্তে অবতরণ করেছিলেন সাকাংশ্য নগরের। এই দুই ঐতিহাসিক পুণ্যময় ঘটনাকে ভিত্তি করে সাধারণ মানুষ সম্মিলিতভাবে এই ফানুসবাতি প্রজ্জ্বলিত দেখা যায়। এ পর্যন্ত উক্ত ফানুসবাতি দ্বারা কারো ঘর-বাড়িতে পড়ে তা নষ্ট করেছে এমন কোন নজির নেই। অন্যদিকে বিনয়শীল ভিক্ষুদের জন্য এ পবিত্র দিবসটি ত্রৈ-মাসিক ব্রত ক্ষেত্রে পালনে সমাপ্তি দিবস হলেও এর চেয়ে তাৎপর্যপপূর্ণ হচ্ছে দোষ-ত্রুটি স্বীকার পূর্বক স্বীয় অপরাধ থেকে মুক্তির জন্য বয়:জ্যেষ্ঠ সংঘসদস্যের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। সাধক পুরুষ এবং জ্ঞানতাপস মাত্রেই ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র অপরাধ মূলক কার্যক্রম থেকে স্নেহধন্য বয়:কনিষ্ট শিষ্যদের ক্ষমা দৃষ্টি দিয়ে দেখেন। জ্ঞানীরা বলেছেন ক্ষমা হচ্ছে মহত্ত্বের লক্ষণ। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কোন না কোন ভাবে পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন কারণে বা অকারণের ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। এ প্রবারণা পূর্ণিমা দিবসে মহান ভিক্ষুরা একত্রিত হয়ে পবিত্র ভিক্ষু-সীমায় অথবা বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে একত্রিত হয়ে ছোট-বড় অপরাধজন কাজ থেকে পরিশুদ্ধ হওয়ার প্রত্যাশা করতে দেখা যায়। তাতে ব্রহ্মচর্য জীবনও পরিশুদ্ধ হয় এবং সাংঘিক জীবনও পরিশুদ্ধ হয়। তখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতা, সদভাব, সহানুভূতি এবং সৌ-ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন সুদৃঢ় হয়। যে কোন মহৎ ও মাঙ্গলিক কার্যক্রমে একে অপরকে সহায়তা করতে দেখা যায় শুধু তা একজন আর একজনকে কোন ভাল ও উন্নতির কাজ নির্দেশ প্রদান করলে সাথে নিষ্ঠার পালন করতে দেখা যায় বা যেত। ইদানিং সেই মধুর সম্পর্কে তুলনা মূলক কম দেখা যায়। এতে আমি মনে করি প্রবারণার মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম হয় নি নতুবা এর গুরুত্ব পালনে অনিহা। তাই সাংঘিক অবতকাঠামো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আত্মকেন্দ্রিক, আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং নিজস্ব নাম-যশ কীর্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার অপপ্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে বেশি। এটা সাংঘিক সমাজের জন্য যেমন শুভ লক্ষণ নয় তেমনি গৃহী সমাজের জন্যও মহাক্ষতিকর বটে। যা বর্তমান সমাজ অবকাঠামোতে অহরহ অসাম্যতা, উৎশৃঙ্খলতা এবং ভুল-বুঝাবুঝির কারণে দূরত্ব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। আর অভিভাবক যদি স্বীয় নৈতিক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আন্তরিক এবং উদার না হয় তাহলেও ছোট-বড় উভয়ের মধ্যে নানা সমস্যার সূত্রপাত ঘটতে দেখা যায়। তখন সাংঘিক অবকাঠামো হয় দুর্বল। ব্যক্তি-পরিবার ও সমাজ জীবন হয় কলুষিত। উভয় সংঘের জন্য কোনটাই শুভ লক্ষণ নয়, বরং আত্মঘাতী মনোভাব প্রকট আকার ধারণ করে। তাতে প্রবারণার বিশেষত্ব রইল কোথায়? বুদ্ধ শিক্ষা মূলত: প্রথমত: আত্মশুদ্ধি অর্থাৎ পবিত্র মন-মানসিকতা না হলে সুন্দর ও মাঙ্গলিক কাজে ব্রতী হওয়া যায় কি? এভাবে নিজ কল্যাণ বা মঙ্গল হবে নাকি পরকল্যাণ বা পরমঙ্গল হবে? আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন সম্ভবনা থাকে না। বরং অন্তরায় সৃষ্টি হয়। কোনটার অর্জন তো আমার দ্বারা হবে না। এ দুর্লভ মানব জন্মের স্বার্থকতা কোথায় প্রশ্ন জাগে নয় কি? সবাইকে মনে রাখতে হবে আত্মশুদ্ধি ছাড়া আত্মদর্শন হয় না। তা যদি না হয় নিজ সম্পর্কে অজানাই থেকে যায়। সেই মানুষের মূল্য বা মূল্যায়ন কোথায়? এ গুলি বোঝার জন্য প্রয়োজন বিবেকবোধ, আত্মসচেতনতা এবং ভাল-মন্দ চিহ্নিত করতে হলে বিবেক ও বৌদ্ধিক চেতনার বিকল্প নেই। বিবেক বর্জিত মানুষ মাত্র পথ ভ্রষ্ট হয়। তাছাড়া শুভ-অশুভ, মঙ্গল-অমঙ্গল, কল্যাণ-অকল্যাণ কোনটাই সঠিকভাবে হয় না। যতদিন আত্মোপলব্ধির মনোভাব উৎপন্ন হবে না ততদিন ভাল বা কল্যাণ প্রত্যাশা করাটাই ভুল। পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি এই পরিণতির স্বীকার হতে বাধ্য। সাংঘিক সংগঠন এবং গৃহী সংগঠন একই অবস্থার স্বীকার। এতে সংগঠন দাবী নয় সংগঠনকারীই অনেকটা দায়ী। স্বীয় দোষ স্বীকার না করে অপরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমার জীবন শুধু আমার জন্য নয়, অনেকের উন্নতি এবং কল্যাণের জন্য। সাংঘিক অবকাঠামো এর চেয়েও অনেক উন্নত। যার দ্বারা সামগ্রিক উন্নতির ও কল্যাণ নির্ভর করে। মানুষই মানুষের সমস্যার সমাধান দেবে নিজের আত্মশুদ্ধি এবং বিবেক দ্বারা। বিবেক আত্মকেন্দ্রিক হলে বিবেকবর্জিত কাজ করতে দ্বিধা নেই। তখন নিজেকে আত্মশুদ্ধি দাবী করতে পারি না। এতে শুরু হয় মত-দ্বৈততা, দ্বন্দ্ব, কলহ এবং নানা সমস্যা। ভুল সংশোধন করে শুদ্ধিব্রত ধারণ সত্য-সুন্দর, কল্যাণের ব্রতকে ধারণের মাধ্যমে প্রবারণার সফলতা। তখন সম্যক জ্ঞান জন্ম। এতে সত্য ছাড়া মিথ্যার লেশমাত্র থাকবে না। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ-জাতি নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হবেই হবে। এটাই বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম বিনয় শিক্ষার প্রভাব। প্রাবরণা উদ্‌যাপন মানে অশুদ্ধ থেকে শুদ্ধি, অজ্ঞানী থেকে জ্ঞানী হওয়াকে বুঝায়। অথবা জ্ঞানী হওয়ার জন্য কৃত সংকল্পবদ্ধ হওয়া। জ্ঞানীরা বলেছেন- লেখাপড়া এক, জ্ঞান অন্য। লেখাপড়ায় অনেক সময় বুঝেও না বুঝার বান করতে দেখা যায়। এটাই তো লেখা-পড়ার সুফল বলা যায় না। লেখা-পড়া মানে শুধু বিদ্ধান হওয়া নয় জীবনাচরণে শুদ্ধ ও উন্নত মনের অধিকারী হওয়া। যা দিয়ে মানুষ ভাল কাজে ব্রতী হয়। বুদ্ধ শিক্ষায় আত্মশুদ্ধিতাকে বড় করে দেখেছেন, আর বড় করে দেখেছেন আত্ম-জিজ্ঞাসাকে। প্রতিটি মানুষ যদি নিজেকে নিজে আত্ম-জিজ্ঞাসা করে আমি কি? কি হব, কি হওয়া উচিত? তখন তার বিবেক বলবে আমি ভাল মানুষ হব। ভাল মানুষ মাত্রই খারাপ চিন্তা-ভাবনায় জড়িত হয় না। ভাল মানুষই জ্ঞানী মানুষ। তার কাছে লেখাপড়ার দাম আছে। তিনি বরং অপরকেও ভাল করে লেখাপড়া করার পথে দেখিয়ে দেন। এটা তার আনন্দ এবং পরম লাভ। প্রবারণার অন্য আর এক অর্থ হল 'আশার তৃপ্তি' অর্থাৎ মহৎ থেকে মহৎ হওয়াকে যে আশা বা কৃতসংকল্পবদ্ধ হতে হয় তা সময় সাপেক্ষ কিন্তু তা একদিনে পূরণ হয় না। দীর্ঘকাল ব্রত পালন, সংযত ইন্দ্রিয়, ধ্যান, সমাধির অনুশীলন, নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে মানুষ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। এখানেই বুদ্ধ শিক্ষার মহিমা পরিস্ফুটিত হয়। অন্যদিকে তৃপ্তি বলতে ভোগ্য-বস্তু উপভোগ নয়, নিত্য-নতুন যা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি